নানা রঙের ছবি

একটি ছবি আর সেই ছবি নিয়ে কিছু গদ্য। এভাবেই তুহিনশুভ্র বুনে ফেলেছেন নানা রঙের ছবির শব্দময় অ্যালবাম।

১

বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর। দিগন্ত দেখা যায় না। ছবির অন্তর জুড়ে কেবলই ধু ধু শূন্যতা। প্রখর দাবদাহে কচি ঘাসের জীবনরসটুকুও ধোঁয়া হয়ে উবে গেছে। তপ্ত মাটির স্পর্শে কম্পমান হাওয়ার শরীর দূরের দৃষ্টিতে যেমন মরীচিকার জন্ম দেয়, তেমনি রেখা আর পার্সপেক্টিভের জাদু আমাদের চোখেও একরকম ইলিউশান তৈরি করে। এরই মাঝে অনন্তকাল ধরে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে চলেছে এক একাকী গাছ-পরিবার। তারা পরিজনহীন, পরিত্যক্ত। কোনো নির্মম কঠিন বিচারে প্রতিবেশিরা তবে কি তাদের পরিত্যাগ করেছে? নাকি মন্বন্তরের কবলে আজ তারা সুজনহারা? কিংবা দেশভাগের যন্ত্রনা বুকে চেপে ছিন্নমূল পরিবার আজ গৃহহীন প্রান্তরবাসি? কিন্তু কী আশ্চর্য, এত প্রতিকুলতাও তাদের অদম্য ঋজুতাকে নুব্জ্য করে দিতে পারেনি। মাথার উপর লেলিহান উত্তাপ অগ্রাহ্য করেও তারা একই ভাবে অপেক্ষমান। এ অপেক্ষা অনন্ত, আবহমান। কিসের এই অপেক্ষা? কালবৈশাখীর?

২

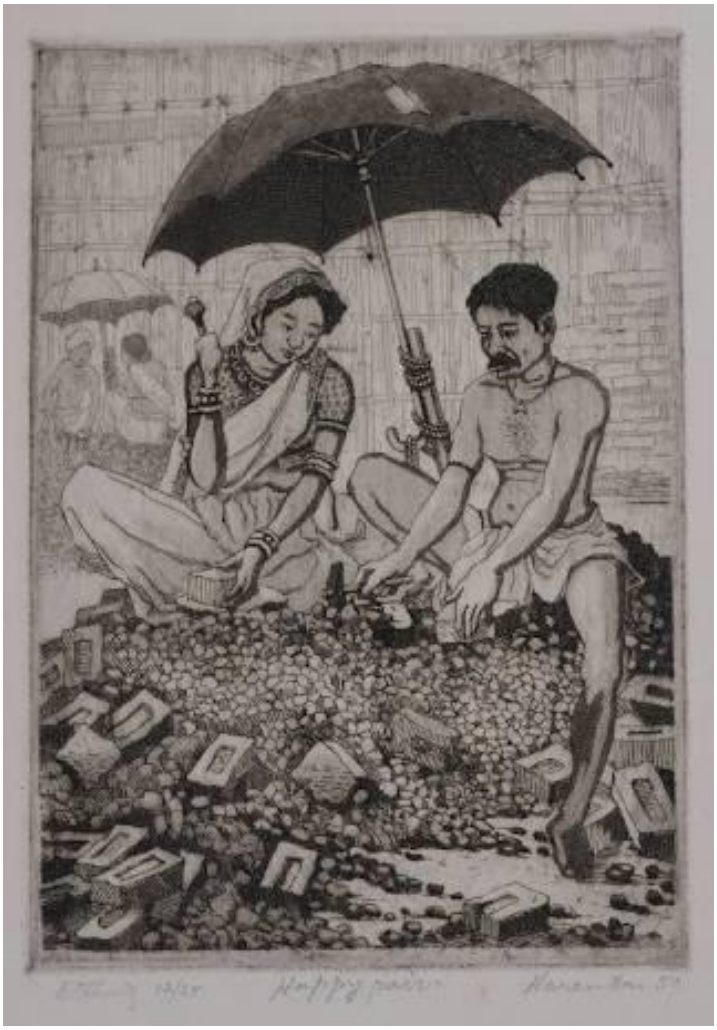

পরিশ্রমের কোনো বিকল্প হয় না। তা সে রুটিরুজির জন্যই হোক কিংবা রোজকার যাপনকে আরেকটু স্বচ্ছল করার তাগিদেই হোক। আবার এও শোনা যায় কাজের মধ্যে দিয়েই মানুষের মুক্তি। কিন্তু সত্যিই কী তাই? ভালবাসাহীন কর্ম যে পণ্ডশ্রমের সমান। আর জগতে সেই সব কর্মই স্থায়িত্ব পায়, যার অন্তরে থাকে ভালোবাসার নরম স্পর্শ। এভাবেই যুগযুগ ধরে শিল্পীর গভীর মমত্ব ভালবাসায় ধ্বংসের উল্টোদিকে টিকে থাকে *ম্যাডোনা*, *সিয়েস্তা*, *সাঁওতাল পরিবারের* মতো অজস্র জীবনের গল্প। এখানেও শিল্পী কাঠ খোদাইয়ে তেমনই এক গল্প বুনেছেন। বাঁচার তাগিদে নাকি একে অপরের শ্রমের ভার ভাগাভাগি করে নিতে নারী-পুরুষ আজ উভয়েই হাতে তুলে নিয়েছে পাথর ভাঙার হাতুড়ি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুর্গম কাঁকুরে চড়াই-উতরাইয়ের মতোই তাদের সম্মুখে ইঁট-পাথরের পথ বিছানো। ধৈর্য, সাহস, ভালবাসার যৌথতায় একে একে সে পথের পাথর ভেঙে পৌঁছতে হবে গন্তব্যে। ওদের মাথার ওপর পারস্পরিক নির্ভরতার ছাতা দৈনন্দিন গার্হস্থ্যের তাপ-উত্তাপ থেকে বাঁচিয়ে চলেছে। দারিদ্র কখনো বা টান মেরে ছিঁড়েছে সে ছাতার কাপড়, কিন্তু সহমর্মীতায় আঁচড় বসাতে পারেনি। ছেঁড়া স্থানে পুনরায় পড়েছে ভালবাসার অঙ্গীকারের অটুট তাপ্পি। এ গল্প যেন ওদের একার নয়, সর্বজনীন হয়ে ধরা পড়েছে শিল্পীর চোখে। তাই বোধ হয় অনতিদূরে আর এক দেহাতি দম্পতির পাথর ভাঙার রোজনামচা। তারা দিনরাত আগামীর জন্য পাথর ভেঙে চলেছে এই আশায় – ভাঙা পাথরের টুকরো দিয়ে একদিন আগামী হয়তো বানাবে ভালোবাসার ইমারত!

৩

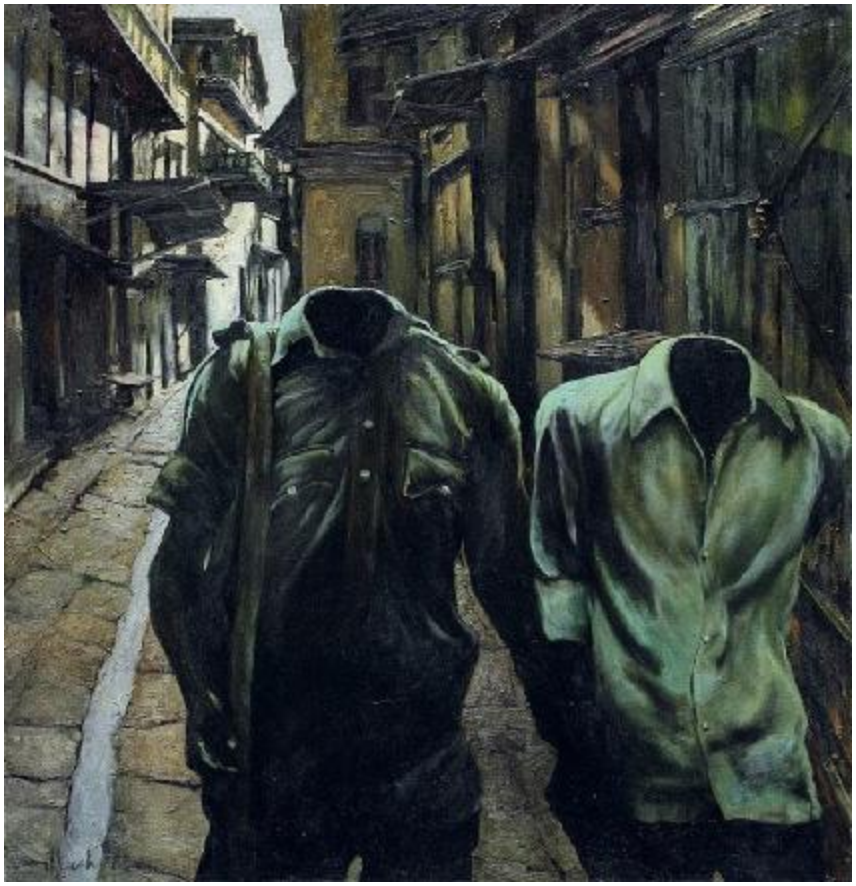

মুণ্ডহীন দুই যুবক হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছে শহরের গলিপথ দিয়ে। গলির দুধারে উঁচু উঁচু বাড়ি। দৈত্যাকার বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে সে গলিপথ। সে গলির কোথায় শুরু কোথায় শেষ কিছুই দেখা যায় না। তবে কি অদূরেই কোনো রাজপথে গিয়ে মিশেছে? আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ পেরিয়ে জীবননদী যেমন সীমাহীন শান্ত-সমুদ্রে গিয়ে মেশে। আবার হতেই পারে নিতান্তই নামগোত্রহীন একটা এঁদো, কানাগলি। যেখানে না থাকে কোনো কিনু গোয়ালা, না বাজে কোনো বাঁশি। তবে কীসের চিহ্ন লেগে আছে সে পথের গায়ে? ফেলে আসা দামাল কৈশোরবেলার নাকি ভবিষ্যতের অপার সম্ভাবনার? যার বীজ দুই যুবকের নবীন হৃদয়ে পোঁতা হয়েছিল এমনই এক কাকডাকা ভোরে? গলির মাথায় এক ফালি আকাশটুকু তবে কি ওদেরই অস্ফুট স্বপ্নের নির্বাক দ্যোতনা হয়ে ঝুলে আছে? তাদের মস্তকহীন ধড় বিষন্ন সবুজ আর মলিন সাদা জামার নিচে ঢাকা। হয়ত রাষ্ট্র ওদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তাই কাঁধের ঝোলায় গোপন নথি আর আস্তিনের ভাঁজে প্রতিশোধের ভয়ানক বিষ লুকিয়ে রেখে চলতে হয়। সুযোগ পেলেই ছুঁড়ে দিতে হবে নির্মম ক্ষমতার মুখে। শোনা যায় যুদ্ধের সময় সৈনিকদের মাথা বন্ধক রাখতে হয় দেশচালকের হাতে। এটাই যুদ্ধের দস্তুর। এখানে প্রতিপক্ষ সর্বদাই শত্রু, সে বন্ধু, পরিজন যেই হোক না কেন। ইংরেজ কবি ওয়েনের 'স্ট্রেঞ্জ মিটিং' এর সাথে কোথাও যেন এ ছবির বক্তব্য মিলে যায়। এখানে মৃত্যুর পর পরলোকে দুজন সৈনিকের দেখা হয় এবং তাদের মৃত্যু যে কতটা নিরর্থক, অনাড়ম্বর, তাৎপর্যহীন বুঝতে পেরে তারা একসঙ্গে বিলাপ করে। হতেই পারে এরা তেমনই কোনো মুক্তিযোদ্ধা যারা দেশের জন্য তাদের কাটা মুন্ডু উপহার দিয়েছে শত্রুপক্ষকে লোফালুফি খেলার জন্য!

৪

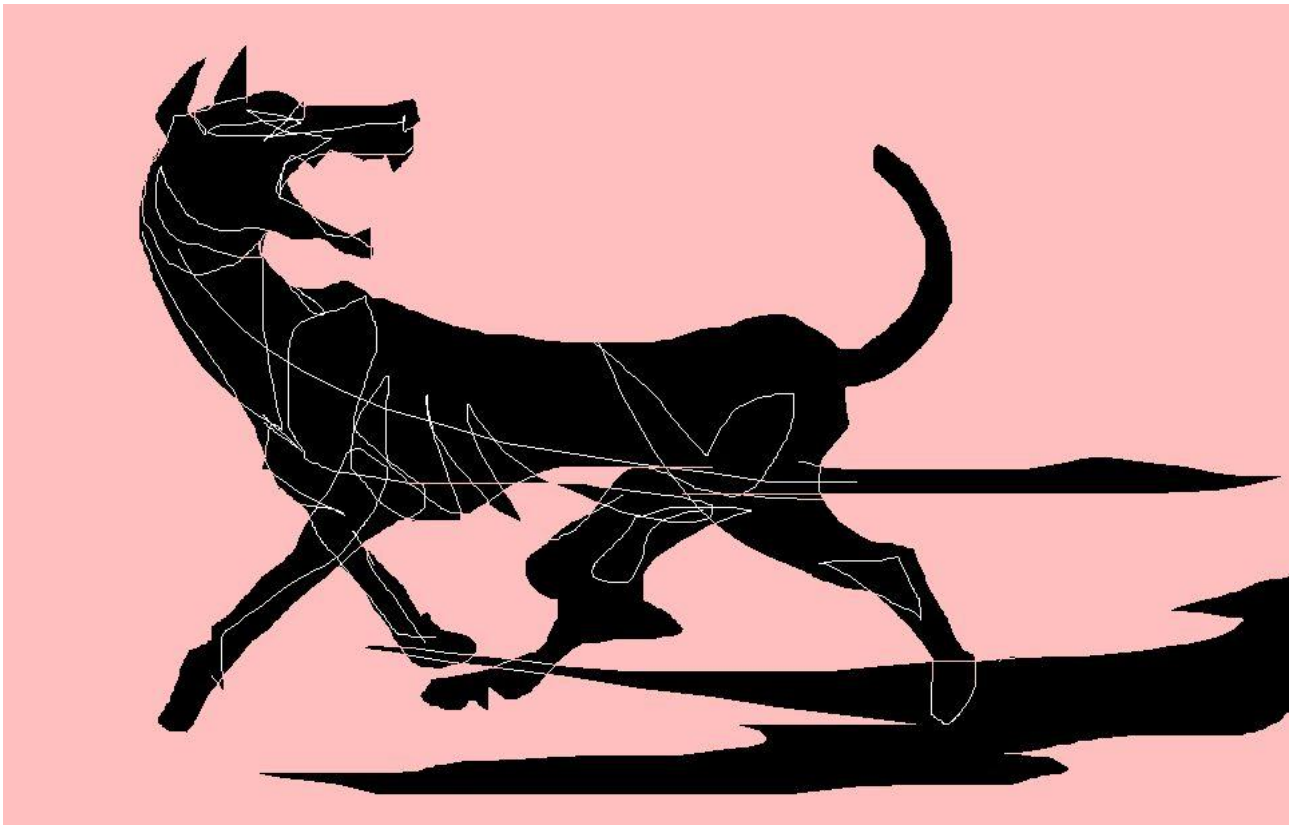

পৃথিবীর সবচাইতে অনুগত ও প্রভুভক্ত প্রাণী বলা হয় সারমেয়কে। ইতিহাস যদিও বলে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ ঘোড়াকেই প্রথম পোষ মানায়। লক্ষ্যণীয় হলো এই দুটি প্রাণীই শিল্পীর রঙ-তুলি-পেন্সিলে বারবার নানান ভঙ্গিমায় ধরা দিয়েছে। ঘোড়া ও সারমেয়কে বিষয় করে বিভিন্ন সময়ের শিল্পীরা ছবি এঁকেছেন। এ ছবিতে দেখা যায় একটি ছুটন্ত সারমেয় মুখটা পিছনের পথের দিকে ঘুরিয়ে চিৎকার করে কিছু যেন বলতে চাইছে। হাঁ-মুখ থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে আপোসহীন ক্রোধ। নির্মেদ শরীরের ভাঁজে উঁকি দিচ্ছে দুঃসাহসী তেজ। এতটাই তীব্র সে চিৎকার যে ফুলে ওঠা পেশিবহুল গলা ফুঁড়ে দর্শকের কান পর্যন্ত পৌঁছে যেতে চাইছে। কার উদ্দেশ্যে তার এই চিৎকার? প্রভুরূপী সমস্ত মনুষ্য সমাজের প্রতি? যারা কেবল তর্কাতীত দাসত্বকে কদর করে, পুরস্কৃত করে? বহু যত্নে রক্ষিত সাধের প্রভুত্বের প্রতি হঠাৎ যদি কোন মনুষ্যেতর অনাস্থা প্রকাশ করে বসে, লালিত প্রভুত্বকে অস্বীকার করে বসে, তবে তার নসিবে গলাধাক্কা ছাড়া আর কী বা জুটতে পারে? তা সে প্রভুর যতই নুন ও লেড়ো খেয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ডিউটি নিভাক না কেন! বলা হয় সীমাহীন প্রভুত্ব আর অমৃতর স্বাদ নাকি একই!

শিল্পী কি তবে এই অধীনতার করুণ দিকটি বারবার ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চান? আবহমান দাসত্বের ক্ষততে নরম তুলির স্পর্শ বুলিয়ে শিল্পী হয়ত দিতে চান সাময়িক উপশম।

৫

পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, পবিত্র ও লাবণ্যময় তাদের মিলিত সুবাস যেন রজনীগন্ধার শুভ্রতায় অমরত্ব পেয়েছে । মহাজাগতিক অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে ভালোবাসার চাঁদ । সে চাঁদের গায়ে আজ নেই কোনো কলঙ্ক, আছে অপার্থিব সুরের মায়াবী ছায়া । বহু যুগের প্রাচীন সুর, ধুলোটে চাঁদের ম্রিয়মান আলো, আর জৌলুস হারানো রজনীগন্ধার সাবেকী সুবাস আজ এক হয়ে তৈরি করেছে রূপ রস গন্ধের এক আশ্চর্য হারমোনি । জগতে কোনোকিছুই স্থায়ী নয় । এমনকি সুন্দরের অগভীর জন্মমূলটিও ইমপারমানেন্সের গভীর কবরে শায়িত । তবুও আদিকাল ধরে শিল্পের আঙিনায় সুন্দরকে ছন্দ বর্ণ গন্ধ গীতিতে চিরপ্রতিষ্ঠা দিতে শিল্পীর নিরলস প্রয়াস জারি আছে । জরা ব্যধি ক্ষয় অন্ধকারের ভয়াবহতা তীব্র ভাবে ধরা দিয়েছে ঘন কালো রঙের প্রেক্ষাপটে । ঠিক তার পাশেই সাদা রঙের আড়ম্বরহীন উপস্থিতি নীরব অথচ জোরালো প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । যেন কোনো একদিন সমস্ত কালিমা ঢেকে দিয়ে বাতাসে উড়বে শুভ্র বিজয়পতাকা, মনের এই সাধ । তাই কালোর উপরে সাদার ক্রমাগত বিচ্ছুরণ স্পষ্ট । সাদা-কালোর এই চিরন্তন বৈরিতা চলে আসছে সেই আদিকাল থেকেই । কিন্তু শিল্পীর কাছে এই দ্বৈরথ কখনোই মেনে নেবার নয় । শিল্পীর তুলি কেবলই জয়ের স্বপ্ন দেখে, শুভ্রতার জয়-পবিত্রতার জয়-সুন্দরের জয়, জয় ভালোবাসার ।

ছবিগুলির শিল্পী পরিচয় : ১। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়; ২। হরেণ দাস; ৩। বিকাশ ভট্টাচার্য; ৪। পঞ্চানন চক্রবর্তী; ৫। কৃষ্ণজিৎ সেনগুপ্ত